ব্যারিকেড

বাংলা সাহিত্যের মন্দ্রস্বর

সম্পাদনা

পার্থ দে

সম্পাদকের কথা

ছোটগল্প যদি হয় বাংলা সাহিত্যের মধুর স্বর, সামাজিক উপন্যাস যদি হয় সৎ স্বর, তাহলে থ্রিলার বা রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প-উপন্যাসগুলিকে কী বলি? আমি তো বলব— মন্দ্রস্বর! ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'ব্যারিটোন'। যা পাঠকের মনে যেমন ভয়-ধরানো এক সমীহ সঞ্চার করবে তেমনই আকর্ষণও করবে। তাই পাঠককে আকর্ষণ-বিকর্ষণের এক অদ্ভুত রসায়ন নিয়ে থ্রিলার লেখা হয়। সেজন্য পাঠকও গোগ্রাসে গিলতে পছন্দ করে থ্রিলার। পাঠকদের পছন্দ অনুযায়ী থ্রিলারের নানা রকমফের আছে— রহস্য, গোয়েন্দাকাহিনি, ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনি, আনক্যানি স্টোরিজ, কল্পবিজ্ঞান। এক-একজন পাঠক এক-একরকমের থ্রিলার পছন্দ করেন। তাই 'ব্যারিটোন' তথা মন্দ্রস্বর সংকলনটির কাহিনিগুলিও বাঁধা হয়েছে ব্যারিটোনের বিভিন্ন স্কেলে। পদার্থবিদ্যার শব্দবিজ্ঞানে অ্যামপ্লিট্যুড বাড়ালে যেমন শব্দের লাউডনেস বাড়ে, তেমনই এই ব্যারিটোন সংকলনের গাম্ভীর্য বাড়ানো হয়েছে নানা গল্পে ভয়, রোমাঞ্চ, সাসপেন্স ও ম্যাকাবরের ডোজ বাড়িয়ে-কমিয়ে। ফলে প্রতিষ্ঠিত ও নবীন লেখকদের কাহিনিতে সেজে ওঠা এই সংকলন হয়ে উঠেছে এক পারফেক্ট ব্যারিটোন, যা পাঠকমনে এক ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে, অ্যাড্রিনালিন তাড়িত উত্তেজনার সন্ধান দেবে। মোট তেরোটি বিভিন্ন

জঁনরার কাহিনি আছে এই সংকলনে, যা লিখেছেন এই সময়ের অন্যতম সেরা থ্রিলার লেখকেরা।

পাঠক, আপনাকে 'ব্যারিটোন'-এর রোমাঞ্চকর দুনিয়ায় স্বাগত। এখন নিজের সিটবেল্ট বেঁধে নিয়ে রোলার কোস্টার জার্নিতে নেমে পড়ুন। পাঠের পূর্ণ আনন্দ নিন।

ইতি বিনত—

পার্থ দে
সম্পাদক

সূ চি প ত্র

একা অথবা...
রাজা ভট্টাচার্য ❖ ৭

আশ্চর্য সাঁকো
জয়দীপ চক্রবর্তী ❖ ২৭

নিয়ন্তা
পিয়া সরকার ❖ ৪০

নরকের দ্বার
শুভব্রত বসু ❖ ৭৭

মাঝদরিয়ায় আইল তুফান
কৌশিক সামন্ত ❖ ১০০

অমর চিত্রকথা
শরণ্যা মুখোপাধ্যায় ❖ ১১০

শেষ ঠিকানা
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ❖ ১২৩

নন্দিনী
মোহনা দেবরায় ❖ ১৪২

রোগ
কর্ণ শীল ❖ ১৫৩

ঘুমের দেশে
ঐষিক মজুমদার ❖ ১৬৬

স্পর্শ
অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী ❖ ১৮৬

কালনিশি
সোমজা দাস ❖ ১৯৯

স্ট্রবেরি ফ্লেভার
পার্থ দে ❖ ২১৭

একা

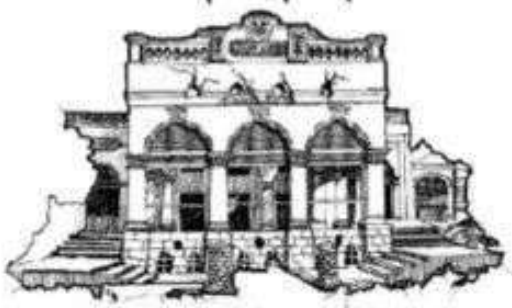

অথবা...

রা জা ভ ট্টা চা র্য

১

"আজও তুই যাবি না?" পূর্বা যতটা সম্ভব নির্বিকার গলায় বলার চেষ্টা করল। খুব একটা ভালো হল না অভিনয়টা। গলায় অনিচ্ছাকৃত একটা মিনতির সুর লেগেই গেল।

হাসি হাসি চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দীপ্ত বলল, "টিউশনি আছে রে!" বলে ঠোঁটের একটা মজাদার ভঙ্গি করে অসহায় অবস্থাটা বুঝিয়ে দিল। পূর্বার সঙ্গে সঙ্গে ওই ঠোঁটের উপরে সপাটে একটা চুমু গেঁথে দেওয়ার ইচ্ছে হল প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়। দামাল ইচ্ছেটাকে সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে ক্যান্টিনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল ও।

দুপুর শেষ হয়ে আসছে। পুজোর আগের এই দিনগুলোতে রং পালটায় রোদ। এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। ইউনিভার্সিটির অন্য বিল্ডিংটা দেখা যায়। মাঝের চত্বরে সোনালি রঙের রোদ পড়েছে বাঁকা হয়ে। গাছের পাতাগুলো চকচক করছে সেই রোদ্দুরে।

"একদিন টিউশনি বাদ দিলে কী এমন ক্ষতি হয়ে যাবে রে?" একটু অধৈর্য গলায় বলল পূর্বা।

দীপ্ত আবার হাসল, "করতে হল না তো খুকি! বুঝবে না, টিউশন কী জিনিস। একদিন না-গেলেই ব্যাস— পরের দিন কুরুক্ষেত্র! গত মাসে তো তন্দ্রাদের বাড়িতে দু-দিনের টাকা কেটে নিয়েছে!"

না, পূর্বাকে কখনও টিউশনি করতে হয়নি। ওর বাবা-মা এবং এক কাকা অধ্যাপনা করেন। অন্য কাকা আছেন ব্যাংকের উঁচু পদে। এক কাকিমা স্কুলে পড়ান। সল্টলেকে ওদের বাড়িতে একবার গিয়েছিল দীপ্ত, অন্য সবার সঙ্গেই। ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটার সাজসজ্জা দেখে। আর সেদিন ওকে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল পূর্বার, এমনকি পূর্বার বাবা-মায়েরও। ব্লু জিনসের সঙ্গে আদ্দির পাঞ্জাবি যে এমন মারাত্মক কম্বিনেশন হতে পারে, দীপ্তকে না-দেখলে পূর্বা ভাবতেই পারত না! ঋজা, সাগ্নিক, সুমন— সবার চাইতে সস্তার পোশাক পরেও সেদিন ঝলমল করছিল দীপ্ত। ওর দীর্ঘচ্ছন্দ সুঠাম চেহারা, ওর টকটকে রং, তীক্ষ্ণ নাক, গোলাপি ঠোঁটের উপরে সরু লালচে গোঁফের রেখা, আর কোমল সরল হাসি— সব মিলিয়ে ইউনিভার্সিটির চেনা ছেলেটা সেদিন অন্য রূপে দেখা দিয়েছিল। আর তাই...

আর তাই সেদিনই নিঃশব্দে মরে গিয়েছিল পূর্বা। উনিশ বছর বয়েসে যেমন মধুর মরণ হয় মানুষের, তেমনভাবেই। ওর মাথাতেই ছিল না— দীপ্তর সম্পর্কে ও প্রায় কিছুই জানে না। ও কোথায় থাকে, ওর বাড়িতে কে কে আছে, তাঁরা কী করেন; কেন দীপ্তকে ইউনিভার্সিটির সময়টুকু বাদ দিয়ে রাতদিন টিউশন করতে হয়— কিচ্ছু না। ওর শুধু মনে হয়েছিল— এই সেই পুরুষ, যার জন্য ও আকৈশোর অপেক্ষায় ছিল। যেদিন থেকে ও একজন নারী হয়ে উঠেছিল, সেদিন থেকেই এমনই একজন পুরুষ ওর রাতের স্বপ্নে হানা দেয়, অন্ধকার ব্যালকনিতে বসে ভরাট গলায় গেয়ে যায় ঘুম-ভাঙানিয়া গান!

আসলে পূর্বা সেদিনই বড়ো হয়ে গিয়েছিল। 'মেয়ে' থেকে 'নারী' হয়ে উঠেছিল দীপ্তর অলীক স্পর্শ পেয়ে। একবার, শুধু একবার দীপ্তকে সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করার জন্য ওর সমস্ত অস্তিত্ব মথিত হয়ে যাচ্ছিল। অথচ দীপ্ত

ওকে স্পর্শ করার সুযোগ দেয়নি কখনও। সুযোগ নেয়নি কখনও। এক আশ্চর্য সুন্দরী তরুণী তার উন্মুখর প্রেম নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বিভক্ত ওষ্ঠাধরে। কিন্তু দীপ্ত হয় বুঝতেই পারছিল না, নইলে...

এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা পূর্বা ভাবতেই চায় না। ওকে দীপ্তর ভালো লাগে না, কিংবা অন্য কারও সঙ্গে দীপ্তর অ্যাফেয়ার আছে, এমন কোনও সুদূরপরাহত সম্ভাবনা মাথায় এলেও ওর চারপাশের পৃথিবীটাকে তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। যতক্ষণ ইউনিভার্সিটিতে থাকে ও, ওর আধখানা মগজ আর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দীপ্তর দিকেই। কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলছে দীপ্ত— একটি মুহূর্তও ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

কিন্তু এই গোয়েন্দাগিরি আর ভালো লাগছে না পূর্বার। আজ ওরা পাঁচজন মিলে বাবুঘাটে যাবে বলে ঠিক করেছিল। দীপ্তকে বলার দায়িত্ব নিয়েছিল ঈশান। যথারীতি দীপ্ত রাজি হল না। ও কোথাও যেতে চায় না ওদের সঙ্গে। একই অজুহাত দেয়। পড়ানো আছে। তখন যেচে দায়িত্ব নিয়েছিল পূর্বা। একটাই অফ পিরিয়ড আছে আজ; অর্থাৎ তখনই ক্যান্টিনে যাবে দীপ্ত। সেই সময়টাতেই ওকে ধরতে চেয়েছিল ও। একান্তে না হোক, মুখোমুখি।

লাভ হল না। মিষ্টি হেসে ওকে ফিরিয়ে দিল দীপ্ত, যেমনটা ও প্রত্যেকবারই করে থাকে। খুব নরমভাবে না বলতে জানে দীপ্ত। কিন্তু সেই না আর নড়ে না। পূর্বাও জানে। তবু যেন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে বলেই ও বারবার নিজেকে ছুড়ে দেয়।

"যদি কাল করি প্রোগ্রামটা? তাহলেও পারবি না?" প্রায় কাকুতিমিনতি করার ভঙ্গিতে বলল পূর্বা।

দীপ্ত অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চা খাচ্ছিল। ও অফ পিরিয়ডে শুধু একটা কেক আর এক কাপ চা খায়। পূর্বার কথা শুনে অনুতপ্ত ভঙ্গিতে একবার শুধু তাকাল ওর দিকে। তারপর নরম গলায় বলল, "আচ্ছা, তোদের কি ধারণা আমি যেতে না-পারলেই বেঁচে যাই? আমার ভালো লাগে না আড্ডা মারতে? তোদের সঙ্গে আউটিংয়ে যেতে?"

শুকনো গলায় পূর্বা বলল, "কী করে জানব বল? গেছিস কখনও আমাদের সঙ্গে?"

উত্তেজনায় টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল দীপ্ত, "তোর জন্মদিনে যাইনি, বল?

সেই সল্টলেক পর্যন্ত ঠেঙিয়ে... বাপরে! উলটোডাঙা যাও, অটো বদলাও— কম ঝামেলা? তার উপর আবার গিয়ে কিছু চিনতে পারছিলাম না, সব রাস্তা একরকম! তাও গেছি, বল!"

ফ্যাকাশে ধরনের একটুখানি হাসল পূর্বা। হ্যাঁ, এটা সত্যি— ওর জানার মধ্যে এই একবারই নিজের রুটিন থেকে বেরিয়ে এসে কারও বাড়িতে গিয়েছিল দীপ্ত। আর সেই কারণেই বোধহয় পূর্বার এই ধারণাটা কিছুতেই ভেঙে যাচ্ছে না যে, দীপ্ত ওকে... না... ঠিক ভালোবাসে না, কিন্তু একটু অন্য চোখে দেখে।

আর সেই ধারণাটুকুর উপরেই ভর করে সাদা টেবিলের উপর পেতে রাখা দীপ্তর হাত দুটো চেপে ধরল পূর্বা, "তাহলে চল না বাবা! শোন, বাসে বাবুঘাট যাব, নৌকোয় ঘুরব এক পাক, স্কুপে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর আইসক্রিম খাব, তারপর যে যার বাড়ি। তুই ছ-টার মধ্যে টিউশনিতে ঢুকে যেতে পারবি, অসুবিধে হবে না।"

আবার আগের মতো হাসতে হাসতে দীপ্ত বলল, "ওরে বাবা রে! ফ্রেঞ্চ ফ্রাই! আইসক্রিম! আমার কাছে কস্মিনকালেও এত টাকাই থাকে না! যা না রে তোরা! গরিব মানুষের পেছনে কেন লাগছিস বাবা?"

পূর্বার মুখটা আরও মলিন হয়ে গেল। দীপ্ত যেন ইচ্ছে করেই ওর সামনে বারবার করে টাকার কথা তোলে। মনে করিয়ে দেয়— ও গরিব, আর পূর্বারা অবস্থাপন্ন।

সামান্য ক্লান্ত স্বরে ও বলল, "তোকে টাকা দিতে হবে না। আমি দেব। এবার তো চল!"

কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল দীপ্ত। ওর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঠান্ডা গলায় বলল, "যাই রে। এস. জি. স্যারের ক্লাস আছে।" তারপর একবারও পিছনে না-তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল ক্যান্টিন থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে ক্যান্টিনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল পূর্বা। আরও একবার দীপ্ত ওকে স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যান করল। জীবনে এই প্রথম কাউকে বারবার অনুরোধ করে চলেছে পূর্বা, আর সে ওকে প্রত্যাখ্যান করছে বিন্দুমাত্র রূঢ়তা ছাড়াই। একটা অননুভূত তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে আস্তে